Rajshahi University journal of arts & law Vol. 48 (2020) pp. 135-145
ISSN 2309-0898

বুদ্ধদেব বসুর গদ্য : প্রাসঙ্গিক বিবেচনা

মো. আব্দুল খালেক*

Abstract

Buddhadeb Bose is a major writer of Bengali literature. The range of his writings is huge and extensive. He is creative and thoughtful at the same time. He wrote a large number of poems, fiction and prose including research articles. There is also a confusion regarding where his excellence lies. We can understand his approaches to literary criticism by reading his prose writings, the main area of his diverse writing. Reading of his prose works gives a new direction of knowledge. As a matter of fact, he surpassed creative writing by his prose writing, in which he appears as a critic. This paper presents a convincing idea about the origin of Buddhadeb Bose's prose and his humorous prose style.

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ-কাহিনি, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ব্যক্তিগত রচনা, অনুবাদ, শিশুসাহিত্য, কাব্যনাট্য, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী লিখেছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *মর্ম্মবাণী* (কবিতা)-র রচনাকাল ১৯২৩-২৪ (প্রকাশকাল অমুদ্রিত) এবং সর্বশেষ গ্রন্থ *কবিতার শত্রু ও মিত্র* (প্রবন্ধ ও নাটিকার সংকলন)র প্রকাশকাল আগষ্ট ১৯৭৪।[১]– শেষ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে মৃত্যুর (১৮ই মার্চ, ১৯৭৪) পাঁচ মাস পরে। পঞ্চাশ বছরে দেড়শ' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনার উদাহরণ শুধু বাংলা সাহিত্য কেন, পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যেও খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রম আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণত আমরা জানি, কোনো প্রতিভার সমকক্ষতা অর্জনে বা স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম হলে একজন লেখক বা পাঠকের সম্মুখে দুটো পথই খোলা থাকে : ঈর্ষান্বিত হয়ে নিন্দা করা অথবা ভক্তিভরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা। কৃচিৎ সে রচনার যথার্থ মূল্যায়ন হয়। রবীন্দ্রনাথ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই জোয়ার-ভাটার খেলাই পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রথমাবধি। কেউ তাঁকে রোমান্টিকতার ফানুসে পুরে সাম্প্রতিক সাহিত্যের এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চান। আবার কেউ তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের একমাত্র বৈচিত্র্যপিয়াসী প্রতিভা বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনে হয়, সত্যের অবস্থান উভয় মেরুর মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায়। সমালোচকের প্রয়াস হবে সেই জায়গাটিকেই খুঁজে ফেরা।

২

বুদ্ধদেব বসু আজীবন কবি ছিলেন কি-না তা বিতর্ক-সাপেক্ষ, তবে তিনি যে আজীবন কবিতার– বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কবিতার মিত্র ছিলেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু মিত্র বললে কমই বলা হয়, 'যে দু'জন ধাত্রীর সহায়তায় আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম হয়েছিল'[২], বুদ্ধদেব বসু তাঁদেরই একজন। 'কবিতা' ছিল তাঁর শক্তিশালী হাতিয়ার। তবে একদিন তিনিও কবি ছিলেন। ফুল হয়ে ফোটার আনন্দে বিভোর হতেন, কাব্যকে 'হয়ে ওঠা পদার্থ'ই মনে করতেন– কখনো 'বানিয়ে তোলা জিনিশ' ভাবতেন না।[৩] কিন্তু ফুলের সার্থকতা তো ঝরে পড়ায় নয়, গন্ধ বিলানোয়! একথা বুদ্ধদেব বসুর চেয়ে আর কেউ ভাল করে উপলব্ধি করতে পারেন নি সে-সময়। কিন্তু তিনি নিজের কবিতার পরিচর্যা করেই তৃপ্ত হন নি, আধুনিক কবি ও কবিতাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইলেন গঠনমূলক সমালোচনা সৃষ্টির

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা, E-mail: mithukhalek@gmail.com

আবহাওয়ায়। তাঁর পরিচর্যায় পুষ্ট হয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-০৯৬০), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৭)র মতো আধুনিক কবিগণ। এক্ষেত্রে বলতে হয় বুদ্ধদেব বসুর প্রধান পরিচয়, তিনি সৃষ্টিধর্মী সমালোচক। যেমন রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি। কবি-সত্তা বুদ্ধদেব বসুর গৌণসত্তা– এই সহজ সত্যটি আমরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবো, ততই শিল্পী বুদ্ধদেব বসুর জন্য মঙ্গল।

বুদ্ধদেব বসু ভাষার প্রতি অত্যধিক মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। কবিতাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'spontaneous overflow of powerful feelings'[৪] বলে অভিহিত করেছেন এবং এ-সংজ্ঞার্থ সর্বকালের জন্যই সত্য। আর ভাষার প্রতি অতিমনস্কতা রচনার 'spontaneity' বা স্বতঃস্ফূর্ততার অবক্ষয়ের কারণ। যা বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং এ-যুগের আরো অনেক কবির ক্ষেত্রে ঘটেছে। তাই বুদ্ধদেব বসু যখন বলেন, 'পঁচিশ বছর ভালোবাসাবাসির পর কবিতা এবার যেন রুখে দাঁড়ালো আমার বিরুদ্ধে'[৫]– সম্ভবত তখন তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের একটি নির্মম সত্যকে সকলের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেন। অপরপক্ষে রচনার প্রতি সচেতনতা কিংবা ভাষার প্রতি অতিমনস্কতা একজন ভালো সমালোচকের গুণ। বলাবাহুল্য বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে এই গুণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উদ্ধৃত মন্তব্যগুলোই এই উক্তির পক্ষ সমর্থন করে। একথা আজ সর্বত্র স্বীকৃত যে, 'সমালোচনা লেখা' বা পত্রিকা-সম্পাদনার ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসুর স্থান অতি উচ্চে। মনে হয়, এ-দুটি ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখ করার মতো। কিন্তু তাঁর মতে 'মনের যে-সব বৃত্তির দ্বারা' সমালোচনা লেখা বা পত্রিকা-সম্পাদনা করা যায়, কবিতার জন্ম সেই বৃত্তি থেকে নয়।'[৬] তাই আজীবন তাঁর কবি হবার বাসনা থাকলেও কবিতা 'বানিয়ে তোলা জিনিশ' নয় বলেই কবি হিসেবে সার্থকতা লাভ তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। এতে স্বাস্থ্যবতী বাংলা কাব্যের কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটে নি, অথচ ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সমালোচনা সাহিত্য যথেষ্ট লাভবান হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুকে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। বলা বাহুল্য এই 'দুর্মরতম কুসংস্কারে'র মূলোৎপাটন প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে রম্যরচনা, সমালোচনা বা ব্যক্তিগত রচনা সবকিছুকেই 'প্রবন্ধে'র অন্তর্ভুক্ত করে অতিসরলীকরণের চেষ্টা চলছে। তাই বুদ্ধদেব বসুর সকল গদ্যরচনাকে 'প্রবন্ধ' নামে আখ্যায়িত করে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকের আসনে বসানো হয়েছে।[৭] প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে প্রবন্ধের সংজ্ঞার্থ নিয়ে এবং বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরচনা স্বরূপ সম্পর্কে। অবশ্যি স্বরূপ-লক্ষণ নির্ণয়ের এই জটিলতা থেকে ইংরেজি Essay-ও মুক্ত নয়।[৮] কিন্তু সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নের জন্য ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই শৈথিল্য পরিহার্য। বেকন একেই 'আইডলস অব দি মার্কেট প্লেস' বা 'বাজারী অপদেবতার বাধা' বলে অভিহিত করেছেন।[৯] এ প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> প্রায় সকল জাতীয় সাহিত্যেরই গুণ-কর্ম-বিভাগ অনুযায়ী একটা আত্মপরিচয় আছে; কিন্তু রচনা-সাহিত্য যেন একেবারে জাতি-গোত্রহীন। বিতর্কাত্মক হইলেও কাব্য, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির আমরা একটা লাক্ষণিক পরিচয় ঠিক করিয়া লইয়াছি, কিন্তু রচনা-সাহিত্য বলিতে সাহিত্যের 'মায় চণ্ডীপাঠ ইস্তক জুতা সেলাই' কিছুই বাদ পড়ে না। গুরু-গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, দুর্দান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা, রাজনৈতিক মসীযুদ্ধ আর সমাজনৈতিক ঘোঁট, সাহিত্যিক বিতর্ক এবং সমালোচনা, আর গদ্যচ্ছন্দে লেখকের আত্মপ্রকাশ, ইহাদের সকলকেই আমরা 'রচনা-সাহিত্যের' শ্রীক্ষেত্রে আনিয়া একেবারে এক কারিয়া দিয়াছি। মোটের উপরে গল্প, উপন্যাস এবং নাটক ব্যতীত গদ্যরীতিতে আর যাহা কিছু লিখিত হয় তাহাই 'রচনা-সাহিত্য' নামে অভিহিত।... ইংরেজিতে যাহাকে Essay Literature বলা হয়, সেই অর্থেই আমি 'রচনা-সাহিত্য' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছি। এই অর্থে আমরা বাঙলার রচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ প্রভৃতি কতকগুলি নাম তাহাদের নিজস্ব অর্থ-বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু নাম ব্যবহারে এই অসতর্কতা আমাদের অনেক ভুল ধারণার মূলীভূত কারণ।[১০]

সমালোচনা ছাড়া বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের আরেকটি ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা হচ্ছে ব্যক্তিগত রচনা বা Personal Essay। তিনি কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র সমালোচনা ও ব্যক্তিগত রচনা, প্রবন্ধ বা সাহিত্যের অন্য কোনো শাখা নয়। (যদিও প্রবন্ধ, নাট্যরচনা বা অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাস তাঁর আত্মানুসন্ধানের ক্ষেত্রে।) প্রবন্ধ ও ব্যক্তিগত রচনার মৌল পার্থক্য এই যে, প্রবন্ধে আলোচনা বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এখানে 'যুক্তির সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে মীমাংসার দিকে পৌঁছতে হয়', অথচ 'ব্যক্তিগত রচনা'র বিষয়বস্তুর তাৎপর্যের শেষ রচনায় রমণীয়তার দিকে লক্ষ থাকে বেশি এবং এখানে লেখকের ব্যক্তিত্বের বিভাই প্রাধান্য লাভ করে।

৩

বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিধর্মী সমালোচক। তাঁর সমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য appreciation বা আস্বাদন, valuation বা মূল্যায়ন নয়। আগে সম্ভোগ পরে বিচার– এই-ই হচ্ছে তাঁর মনোধর্ম। আস্বাদন ও সম্ভোগেই সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর চেতনা মুক্তি পায়। এর মধ্য দিয়েই একজন শিল্পী তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটান তাঁর রচনায়। তাঁরা জীবন ও জগৎকে নতুন করে সৃজন করেন এবং শব্দের ইঁট দিয়ে নিত্য নতুন সাহিত্যের ইমারত গড়ে তোলেন। কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন জগৎ ও জীবন। অর্থাৎ ম্যাথ্যু আর্নল্ডের ভাষায় তাঁর জীবনের সমালোচক।[১১] কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর রচনার প্রধান অবলম্বন বাস্তব জীবন নয়, সাহিত্য। দেশ-বিদেশের সাহিত্যই ছিল তাঁর সম্ভোগের বস্তু। অবশ্যি বাস্তব জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র কৌতূহল আছে, কিন্তু সে-জীবনের মুখোমুখি হবার মতো সাহস নেই। তিনি আজীবন স্বপ্নবিলাসী সুন্দরের সাধক। তাঁর ভয় ছিল বাস্তবের সম্মুখীন হলেই স্বপ্নভঙ্গ ঘটবে, অসুন্দর তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে। এ-কারণেই জীবনকে দেখেছেন নিরাপদ দূর থেকে– প্রধানত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। তিনি একদা জীবনানন্দ দাশকে 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগা গোড়া রোমান্টিক'[১২] বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু এ-অভিধা তাঁর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ যে-পূর্ণতার স্বপ্ন তাঁর ছিল, আজীবন তারই সাধনা করেছেন সাহিত্যে। তিনি চেয়েছেন– 'আনন্দের সাহিত্য', বিমর্ষতার নয় :

> জীবনে 'boredom and horror' নিশ্চয়ই আছেন– এবং এটা অপূর্ব কোনো আবিষ্কার নয়– কিন্তু এই 'boredom'-এর কবিদের রচনা পড়তে পড়তে এ-সন্দেহ আমরা কিছুতেই ঠেকাতে পারি না যে তাঁরা নিজেরাই bored, এবং যে-সব কথাশিল্পী আধুনিক সমাজের আতঙ্কভরা কুশ্রীতা দৃশ্যের পর দৃশ্য এঁকে দেখিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদেরও মনে হয় সেই আতঙ্কের মধ্যে আবদ্ধ, তার পরপারে কোনো স্বর্গের সন্ধান তাঁদের কাছে মেলে না, কিংবা যদি বা মেলে, সেটাও মানবিকতার দিক থেকে, মানুষের জীবনের দিক থেকে, ভুল স্বর্গ, অলীক, আত্মপ্রতারক কল্পনা। ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে ব্যাধির বিশ্লেষণ করতে করতে ব্যাধির প্রেমেই প'ড়ে গেছেন এঁরা, চিকিৎসার অন্বেষণের বদলে মড়কের গলা ধরে আঁকড়ে আছেন।[১৩]

সুন্দর জীবন তাঁর কাম্য ছিলো এবং তা 'আনন্দের সাহিত্য'-এর মধ্য দিয়েই সম্ভব। তাই তিনি তাঁর প্রিয় লেখকদের রচনাকে ধীরে ধীরে আস্বাদন করেছেন, উপভোগ করেছেন এবং অবশেষে তাঁদেরকে আবার নতুন করে সৃজন করেছেন তাঁর সমালোচনায়। ফলত প্রতিষ্ঠিত হলেও সকলের সম্পর্কে লেখার তাগিদ তাঁর মনে কখনও জাগে নি। প্রতিষ্ঠিত লেখককে বিচারের তুলাদণ্ডে ওজন করার চেয়ে তাঁর প্রিয় লেখককে প্রতিষ্ঠা দান করার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এটাকে তিনি পবিত্র কর্তব্য বলেই মনে করতেন।

বুদ্ধদেব বসু ১৯৬২ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁর *কবি রবীন্দ্রনাথ* (জুন, ১৯৬৬) ঐ বক্তৃতাগুলো অবলম্বন করে লিখিত। এ-গ্রন্থে সমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে আমরা একটু অন্যভাবে পাই। তথ্যের দাবী মেটাতে গিয়ে এখানে তাঁকে গবেষকের ভূমিকায় নামতে হয়েছিল বলে তিনি কৈফিয়তের সুরে পাঠকদের উদ্দেশে বলেছেন :

> আমি এখনও অটিক রচনারই পক্ষপাতী, কিন্তু 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-এ একাধিক কারণে ঐ দৃষ্টিকটু, চিত্তবিক্ষেপকারী, এবং হয়তোবা বিরক্তিকর উপসর্গ ব্যবহার না ক'রে পারলুম না। প্রথম কারণ, তথ্যের দাবি; যেমন, 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ' অংশে অন্যান্য লেখকদের যে-সব মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি, সেগুলির উৎসস্থল নির্দেশ করার প্রয়োজন বোধ করলুম। দ্বিতীয় কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে-তাঁর ব্যক্তিত্ব বা অন্যান্য কৃতি নয়, বিশুদ্ধভাবে তাঁর কবিতা সম্পর্কে– এ-মুহূর্তে যেটুকু আমরা মৌলিক ও সুচিন্তিত বক্তব্য, সে-বিষয়ে যে-দুটো চারটে ভাবনা মাঝে মাঝে আমার মনে ধরা দিয়েছে, আর যা নিয়ে আমি দীর্ঘকাল ধরে নিজের মনে জল্পনা করে এসেছি, তার সবটুকুই– বা অন্ততপক্ষে তার নির্যাসটুকু– আমি এই একটি পুস্তকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম।[১৪]

বুদ্ধদেব বসুর এ-বক্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট যে, গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। শুধু পরিস্থিতির শিকার হয়ে তাঁকে এই গ্রন্থে তথ্যের দিকে মনোযোগী হতে হয়েছিল। তবু এ-রচনা তথ্য-কন্টকিত নয়। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু এখানে হারিয়ে যান নি।

আমরা বলেছি, বুদ্ধদেব বসুর রচনার প্রধান অবলম্বন সাহিত্য, বাস্তব জীবন নয়। জীবনকেও তিনি রচনার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তবে তা অপরের জীবন নয়, নিজের জীবন। নিরাপদে এই জীবনের মুখোমুখি হওয়া যায়। এই জীবনকে অবলম্বন করেই একে একে রচনা করেছেন *আমার বন্ধু* (১৯৩৩), *হঠাৎ আলোর ঝলকানি* (১৯৩৫), *সব-পেয়েছির দেশে* (১৯৪১), *উত্তর তিরিশ* (১৯৪৫), *আমার ছেলেবেলা* (১৯৭৩), *কবিতার শত্রু ও মিত্র* (১৯৭৪), *আমার যৌবন* (১৯৭৫) প্রভৃতি গ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে কোনোটি স্মৃতিকথা, কোনোটি রম্যরচনা, কোনোটি আত্মজীবনী, অধিকাংশই ব্যক্তিগত রচনা। ব্যক্তিজীবনকেই তিনি এসব রচনায় বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন এবং অপরের কাছে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

আমার ছেলেবেলা গ্রন্থে শুরুতেই বুদ্ধদেব বসু এ-সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার ছেলেবেলার কথা আগে অনেক বার লিখেছি। *সাড়া* উপন্যাসের প্রথম অংশে, *আমার বন্ধু* ও *অন্য কোনখানে* উপন্যাসে, 'পুরানা পল্টন', 'নোয়াখালি', 'চার্লস চ্যাপলিন', ও 'রামায়ণ' প্রবন্ধে, কোনো কোনো ছোটগল্পে ও কবিতায়, তাছাড়া কয়েকটা উপলক্ষমূলক ক্ষুদ্র রচনাতে...'[১৫] সমালোচনামূলক গ্রন্থের বাইরে এগুলোই তাঁর বিখ্যাত গদ্যরচনা এবং রচনাগুলো ব্যক্তিনিষ্ঠ। সুতরাং শুধু 'প্রবন্ধ' নামে এসব রচনাকে চিহ্নিত করতে চাইলে অঙ্গে বস্তুনিষ্ঠার ছাপ পড়ে যায়। ফলত, বুদ্ধদেব বসুর প্রতিভার মূল্যায়নে বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু নিজেও এই বিভ্রান্তিকে আজীবন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন বলেই আজকের ভক্ত-পাঠকও এই ভুলের বোঝা বয়ে চলেছেন। তিনি তাঁর প্রথম জীবনে এ-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ঠিকই। তাঁর এই সচেতনার পরিচয় ২৯-১০-৩৫ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি পত্রে পাওয়া যায় :

> ...'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি' নামে আমার প্রবন্ধের বইটিও আপনাকে পাঠানো হয়েছে ... 'প্রবন্ধ' বলেছি অবিশ্যি, যদিও ওগুলো বাংলা মাসিকপত্রের পাণ্ডিত্যয় উদ্ধৃতবহুল বস্তু নয়–বরঞ্চ essay বলা যায়, যে-ধরনের essay ইংরেজরা লেখে। এই essay জিনিসটার একটা আলাদা নাম হওয়া উচিত বাঙলায় (প্রবন্ধ হচ্ছে thesis, paper, monograph জাতীয়)-'রচনা' কথাটি 'essay'র কাছাকাছি আসে–কিন্তু তা থেকে ইস্কুলের বদগন্ধ কোনো রকমেই একেবারে কাটানো যাবে কিনা তাই ভাবছি।[১৬]

'ব্যক্তিগত রচনা'য় বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের পরে এ ক্ষেত্রে তাঁর মতো শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেনি। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) (১৮৮০-১৯৬০), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২), প্রথমনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) ও সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)র রচনায় ব্যক্তিগত সৌরভের পরিচয় পাওয়া গেলেও এঁরা কেউ 'ব্যক্তিগত রচনা'য় বুদ্ধদেব বসুর সমকক্ষ নন; কিংবা বলা যায়, প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করেন নি। এ-ধরনের রচনার পরিচয় দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু নিজেই তাঁর এক প্রবন্ধে[১৭] বলেছেন :

> যা দেখতে শুনতে প্রবন্ধের মতো, এ-রকম গদ্যরচনার মধ্যে দুটো স্পষ্ট ভাগ দেখা যায় : তার একটাতে বিষয় হ'লো সর্বস্ব বা মুখ্য, লেখক সেখানে নতুন জ্ঞান দিতে চাচ্ছেন, বা নতুন মত প্রচার করা তাঁর অভিপ্রায়। ... আর অন্যটিতে বিষয়টা গৌণ; লেখক রচনাকর্ম শুরু করার আগে তাঁর বাঁচা, মেলামেশা ও সাধারণ পড়াশুনোর বাইরে–কোনো 'গবেষণা' করেন নি; কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা বা সমাজের পক্ষে হিতকারী কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও লিখতে বসেন নি তিনি; লিখতে-লিখতে ভাবনা আসে তাঁর, নিজেকে অনুসরণ ক'রে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যান; তাঁর সূচনা, মধ্যেভাগ ও সমাপ্তির পিছনে থাকে–'বক্তব্য'কে উপস্থিত করার গরজ নয়, সেইসব অমোঘ ও অলক্ষ্য বিধান যা কেনো কবিতা, নাটক বা উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে; তাঁর ভাষায় থকে রূপ, ছন্দ ও স্বাদুতা, পাঠকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সৌজন্য, আসক্তি, হাস্যরসবোধ, জগতের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সংরাগ ও দূরকল্পনা। শিরোনামায় যে–'বিষয়ে'র উল্লেখ থাকে তা নিয়ে যতটা বলেন, হয়তো ততটাই থাকে তাঁর নিজের কথা; আমরা জানতে পারি কী ভাবে এই জগৎ তাঁর চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছে, কোথায় তাঁর প্রেম, কোন সংশয়ে তিনি দষ্ট, কোন গোপন বেদনাকে রচনার মধ্যে দিয়ে পরিপাক ক'রে নিচ্ছেন।...[১৮]

বাংলা সাহিত্যে 'ব্যক্তিগত রচনা'র মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেই এ ক্ষেত্রে যাঁর স্থান, তাঁর নাম অবশ্যই বুদ্ধদেব বসু।

৪

বাংলা গদ্যের নিষ্ঠাবান সাধক বুদ্ধদেব বসু। মৃত্যুর পর কলকাতার 'কলকাতা' পত্রিকা তাঁকে 'একজন ভাষা-শ্রমিক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।[১৯] মনে হয় বুদ্ধদেব বসুর জন্য এ বিশেষণ অযথার্থ নয়। কেননা, 'কবিতা লেখাও একটা কাজ–খাটুনির অর্থে, 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা'র অর্থে কাজ'[২০]-একথা একজন শ্রমজীবীই বলতে পারেন। বুদ্ধদেব বসুও আজীবন বাংলা গদ্যের পরিচর্যা করেছেন শ্রমিকের ধৈর্য ও পরিশ্রম দিয়ে। তাঁর প্রতিভার দুর্লভ স্পর্শে বাংলা গদ্য এভাবেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে যতদূরে এগিয়ে দিয়েছিলেন, বুদ্ধদেব বসুর যাত্রা শুরু হয়েছিল মূলত সেখান থেকেই :

> ভাষা নিত্যপরিবর্তমান, অতি ব্যবহারে অংশত জীর্ণ হ'য়ে আসে; তাই মৌলিক লেখক তাঁর উত্তরাধিকারে তৃপ্ত হন না; অর্থাৎ যতটা ভাষা, ভঙ্গি, কলা-কৌশল তাঁর আগেই তৈরি হ'য়ে গেছে সেটা আত্মসাৎ ক'রে নেবার পর তিনি তাঁর জীর্ণ অংশ ছেঁটে ফেলে তাঁর নতুন আবিষ্কার যোগ করেন। প্রতি যুগে ভাষার এই পুনরুজ্জীবন না-ঘটলে সাহিত্য বাঁচে না, জীবন চলে না।[২১]

বুদ্ধদেব বসু 'মৌলিক লেখক' ছিলেন বলেই ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর উত্তরাধিকারী হয়েও তাঁদের ভাষাতে তৃপ্ত হয়ে সেখানেই থেমে থাকেন নি, বরং তাঁদের কলা-কৌশল আত্মসাৎ করে বাংলা ভাষার নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করার জন্য আজীবন নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী'র গদ্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মন্তব্যগুলো তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর মধ্যে দিয়েই বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবণতার স্পষ্ট পরিচয় মেলে :

(ক)

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চেধুরীর বিশিষ্ট দান তাঁর গদ্য। গদ্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও চৌধুরী মহাশয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাত বাংলা গদ্যে ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়।[২২]

(খ)

From the very beginning of the literary life, Rabindranath rebelled at heart against the prime respectability of sadhubhasa, though for long he was unable in practice to break away from it. The spoken language strongly attracted him, he was in love with its music, its colour, its warmth; he felt in it an abundance of vitality which he hoped to exploit, And he used it in his unofficial writings, in hundreds of letters, in humourous sketches, and of course in his plays and sermons, When he first visited Europe at the age of eighteen, he sent home a series of letters, later collected and published under the title of Europe-Prabashir Patra, written in lovely and lively prose, the prose of everyday speech. An air of joyous freedom pervades these letters, freedom from the cold formality of sadhubhasha; there is in them a ripple as of bright waters a sunny playfulness as of young leaves. These qualities Rabindranath cherished, but, for some strange reason... [২৩]

(গ)

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-বইয়ের মধ্যে আমি জীবন ভ'র সবচেয়ে বেশী বার পড়েছি 'ছিন্নপত্র', আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণের সময় আমি ওটি অতি যত্নে সর্বদা সঙ্গে রেখেছিলাম– বারো হাজার মাইল দূরে ব'সে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের হৃদয়ের স্পর্শ পাবার জন্য। আজ পর্যন্ত, কোনো কারণে পাতা উল্টাতে হলে– হাতে যতই না কাজ থাক সে মুহূর্তে– বেদরকারে দু-চার পৃষ্ঠা পড়ে ফেলার লোভ আমি সামলাতে পারি না।[২৪]

(ঘ)

'সবুজ পত্র' আমাদের জন্য কী করেছে তার আলোচনা নানা স্থলে করেছি, এখানে তার চুম্বক দিতে চেষ্টা করি। এর প্রথম দান প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল, দ্বিতীয় দান চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় (এবং হয়তো মহত্তম) দান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রমথ চৌধুরী আর রবীন্দ্রনাথ–এ-দু'জনের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিলো 'সবুজ পত্রে'; প্রথম জনের আত্মপ্রকাশের জন্য, দ্বিতীয় জনের নতুন হবার জন্য। প্রচলিত অন্য কোনো পত্রিকায়, অন্য কোনো সম্পাদকের আশ্রয়ে প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তার বিকাশ হ'তে পারতো না; তাছাড়া শুধু রচনাতেই নয়, সম্পাদনাতেও তিনি ছিলেন প্রতিভাবান। আর রবীন্দ্রনাথ–তিনি 'সবুজ পত্রে'র কাছে পেয়েছিলেন পুরোনো অভ্যেসের বেড়ি ভাঙার সাহস, যৌবনের স্পর্শ, গদ্য ভাষার জন্মান্তর-সাধনের প্রেরণা... [২৫]

এ থেকে একটি জিনিস সুস্পষ্ট যে, রবীন্দ্রনাথেই বুদ্ধদেব বসুর ভালো গদ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গদ্যের এই অমূল্য উপাদানকে স্বাভাবিক গতিতে পরিচালিত করে পরিণতি দান করেন নি। কোন এক 'অজ্ঞাত কারণে' সবুজ পত্রে'র আবির্ভাবের পূর্বে এ-গদ্য প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্ররচনায় অব্যবহৃত থেকে গেছে।[২৬] কিন্তু *সবুজপত্র*-উত্তর যুগের রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতনের গুরুদেব ও জগতের গুরু স্থানীয়'। ততদিনে স্বাভাবিকতা ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে প্রায় ত্যাগ করেছে। প্রমথ চৌধুরীর উদাহরণে ও উৎসাহে তিনি গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদেরকে বিচিত্র গদ্যভঙ্গী উপহার দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু 'কি-যেন-নেই'- এর কারণে আমরা মুগ্ধ হলেও অভিভূত হতে পারি নি। রবীন্দ্র-গদ্য পরিক্রমায় এ-সবই বুদ্ধদেব বসুর আবিষ্কার। রবীন্দ্র-গদ্যের অপূর্ণতাই বুদ্ধদেব বসুর

গদ্যসচেতনতাকে তীক্ষ্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তরঙ্গ-সঙ্কুলতার জন্য বুদ্ধদেব বসু সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়েই তাঁর গদ্যের তরী ভাসিয়েছিলেন। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় সঙ্গী ছিল তাঁর নিষ্ঠা ও পরিশ্রম। সহায়তার জন্য মাঝে মাঝে তাকিয়েছেন প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজশেখর বসুর দিকে। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত কখনো হন নি।

৫

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম কুমিল্লায় (১৯০৮), তবে তাঁর বাল্যকাল কাটে নোয়াখালিতে।[২৭] অতঃপর এখানেই এগারো-বারো বছর বয়সে রবীন্দ্র-গদ্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তাঁর পঠিত প্রথম দুটি গদ্য গ্রন্থের একটি : 'ছিন্নপত্র'–পত্র সংকলন।[২৮] এ-গ্রন্থ থেকেই শুরু হয় রবীন্দ্র-গদ্যের প্রতি পূর্বরাগ। এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা অনুরাগে পরিণত হয়। এ-সময়ে তাঁর শব্দ-সচেতনতারও পরিচয় মেলে।[২৯]

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম দিকে দুটি গ্রন্থ 'সাড়া' (উপন্যাস–রচনাকাল ১৯২৮-২৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৩০) ও 'রেখাচিত্র' (গল্প সংকলন–রচনাকাল ১৯২৮-২৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৩১) সাধু ভাষায় লেখা। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক: *ছিন্নপত্র*-প্রেমিক বুদ্ধদেব বসু কী-কারণে লেখক জীবনের প্রারম্ভে সাধুভাষাকে আশ্রয় করেছিলেন? সাধুভাষার দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকলেও রচনার মধ্য দিয়ে সেগুলো আবিষ্কার করাই ছিল বুদ্ধদেব বসুর প্রাথমিক কর্তব্য। এ-কর্তব্যের টানেই বাংলা গদ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে বঙ্কিম থেকেই শুরু করতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত 'রেখাচিত্রে'র বুদ্ধদেব বসুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে:

> সদ্যনিদ্রোত্থিতা তোমার মুখে যে-লাবণ্য তখন ফুটিয়াছিল, তাহা তোমার মুখেও কম দেখিয়াছি। ঊষাসঙ্গমে পূর্ণিমার চাঁদের মুখে সর্বশেষ হাসিটুকু যেমন ক্ষণিক, তেমনি ক্ষণিক, হয়তো তেমনি অলীক সেই সৌন্দর্য, যাহা তোমার মুখে, ঠোঁটে, চোখের পাতায় সেদিন দেখিয়াছিলাম। দিনের আলোয় তাহা ম্লান হইয়া যায়... দেবতার ভাষা যদি জানিতাম, তাহা হইলে সেদিন তোমাকে জানাইতে পারিতাম...।[৩০]

তবে 'রেখাচিত্র' গল্পের ভাষা অলঙ্কারমণ্ডিত, গতানুগতিক। অথচ বহুল ব্যবহৃত বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার সাধনাই ছিল গদ্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসুর একমাত্র অভীষ্ট। এবং স্বল্পকালের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, গদ্যকে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত করতে হলে তাকে স্পন্দ্যমান সমৃদ্ধতা দিতে হবে। আর এ-ক্ষেত্রে চলিত ভাষাই অপরিহার্য মাধ্যম। সুতরাং বুদ্ধদেব বসু এরপর থেকে চলিত ভাষায় অসীম সম্ভাবনাকেই কাজে লাগালেন।

কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র বুদ্ধদেব বসু চলিত ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথম জীবনে ইংরেজি শব্দ ও অন্বয়ের মায়াডোরে বাঁধা পড়েছিলেন। তিনি জীবনানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন : 'জীবনানন্দ বাবু বাঙলা কাব্য সাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেন নি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ; অচিন্ত্য বাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্যা imitator জোটেনি।'[৩১] এ-রচনা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু নিজেই ১৯৫৫ সালে মন্তব্য করেছেন :

> 'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে।[৩২]

ভাষার পরিপুষ্টি ও পরিণতির পূর্বশর্ত স্বনির্ভরতা, সন্দেহ নেই। কিন্তু মুখের ভাষার স্বাভাবিক গতিকে অক্ষুণ্ন রেখে অন্য ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য যদি আত্মসাৎ করা যায়, তাতে ভাষার সমৃদ্ধিই ঘটে। সংস্কৃত ভাষার নিগড় থেকে মুক্ত করে বাংলা গদ্যকে সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতি দান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। কিন্তু মুখের ভাষাকে বাংলা গদ্যের প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত করে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। যদিও 'মুখের ভাষায় বাংলা গদ্যের প্রাণশক্তি আছে'–এই সূত্রের আবিষ্কারক তাঁরাই। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় চল্‌তি কথার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও রবীন্দ্রনাথের গদ্যে যে কাব্যসুরের প্রাধান্য ছিল, তা থেকে তাঁর গদ্য মুক্ত হতে পারে নি। সুতরাং বাংলা গদ্য সম্পর্কে কী করণীয় তা বুদ্ধদেব বসু প্রথম থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতের প্রভাব থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্ত করার অর্থ এই নয় যে, ইংরেজির প্রভুত্বকে স্বীকার করে নেয়া। বুদ্ধদেব বসুও তা চান নি। কিন্তু প্রথম জীবনে ইংরেজি গদ্যের সর্বগ্রাসী আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা তাঁর পক্ষে দুরূহ ছিল। তবু ভাষার স্বনির্ভরতার জন্য যতটুকু প্রভাবমুক্ত হওয়া প্রয়োজন, বুদ্ধদেব বসুর অনুশীলনে তা সম্ভব হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই বুদ্ধদেব বসুর নজর পড়লো বাংলা শব্দের ছন্দস্পন্দের দিকে। তিনি শব্দের অনুরণনে বেশ কিছুদিন মাতাল হয়ে থাকলেন। শব্দ নিয়ে চললো নাড়াচাড়া। ফলে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হলো :

(ক)

পুরানা পল্টনের বর্ষার রূপ কিছুতেই ভোলবার নয়; সকাল বেলাকার ছেঁড়া মেঘের আকাশ, ভিজে হাওয়া, মাঠে জ'মে যাওয়া জল, মাঠ-ভরা নতুন সবুজ ঘাস, আমাদের উঠোনের তুলসী মঞ্চে ঘনলতার আড়ালে ঘন-নীল অপরাজিতা, মাটির গন্ধ, বুনো ফুলের গন্ধ। আকাশভরা সেই নরম নীল মেঘ, সেই আশ্রান্ত, অজস্র বর্ষণ; বাইরে তাকালে মনে হ'তো সমস্ত সৃষ্টি যেন ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মনে হ'তো পৃথিবীর শেষ সীমা এইখানে।[৩৩]

(খ)

তারপর থেকে ভবভূতি প্রায়ই আমাকে দেখাবার জন্য তার পদ্য নিয়ে আসতো– একটা নয়, দুটো নয়; রাশি-রাশি, অজস্র শরতের সকালে ঝরে পড়া শেফালির মতো, বর্ষার গ্রামের পুকুরে কচুরি পানার মতো অগুণতি।[৩৪]

(গ)

মনে হয়, শৈশবের অচেতনতার পরে এবং দুঃখের আরম্ভের আগে খেয়ালী বিধাতা আমাদের মুহূর্তের জন্য দেখিয়ে দেন, কত আনন্দ তাঁর এই সৃষ্টিতে ছড়ানো আছে। সুন্দর কৈশোর, তুমি যত সুন্দর, তার চেয়েও অনেক বেশী তুমি ক্ষণিক; তুমি যে কত সুন্দর, তা উপলব্ধি করবার সময়ও আমাদের দাও না– তার আগেই পালিয়ে যাও।[৩৫]

(ঘ)

শাদা ঘর, ধবধবে। ঝক ঝকে। ঝক ঝক করছে খাট; নিভাজ, শাদা চাদরে ল্যাভেন্ডারের ফিকে গন্ধ। আশ্চর্য, যে-গন্ধটা সব সময় কেমন লেগে রয়েছে, গন্ধের অদৃশ্য, পাৎলা ধোঁয়া বাতাসে ঝুলছে। মিষ্টি, অতি-সূক্ষ্ম মিষ্টি, মগজের ভিতর ছুঁচের মুখের মতো গিয়ে লাগে।[৩৬]

শব্দ-চেতনার মধ্যেই বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরীতির মূল রহস্য নিহিত। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভাষার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয় নিত্য-নতুন শব্দ আবিষ্কারে নয়, প্রচলিত শব্দেরই সার্থক ব্যবহারে তাতে সম্পন্নতা আসে। তিনি এ-ক্ষেত্রে এক নিঃসঙ্গ চেতনা নিয়েই কাজে নেমেছিলেন। তাই তাঁর প্রথম দিকের রচনায় লক্ষ করা গেলো উজ্জ্বল অথচ উত্তাল শব্দ, ছন্দময় অথচ মাতাল বাক্য। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকেন নি। বিরামহীন অনুশীলনে তাঁর গদ্য কয়েক বছরের মধ্যেই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠলো। প্রবণতা দেখা গেলো সংহতির দিকে :

(ক)

অন্ধকারে শব্দ শুনলো মৌলিনাথ। একটু পরে আলো জ্বলে উঠলো; তার শিয়রে রাখা টেবল ল্যাম্পের সীমিত আলো ফুটিয়ে তুললো এক চিল্‌তে দেয়াল, জানালার ধুলো-পড়া কাঁচ, পাতার ফাঁকে পোস্ট কার্ড-গোঁজা বই, দিশি নেটের মশারির একটা অংশ।[৩৭]

(খ)

ইংরেজি ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ছিলো যথোচিত মাত্রায় সশ্রদ্ধ ও সাবধানী; তিনি কখনো ভোলেন নি যে সেটা তাঁর পক্ষে বৈদেশিক, সহজাত নয়, এবং ইংরেজি সাহিত্যের ধরন-ধারণও আলাদা; তাঁর পক্ষে ইংরেজিতে লেখার চেষ্টা যে এক অসাধারণ কর্ম সেই চেতনাও তাঁর জাগ্রত ছিলো।[৩৮]

(গ)

কলেজে এসে একটা পরিবর্তন হ'লো আমার। আমি ছেলেবেলা থেকেই পড়তে ভালোবাসি; 'চয়নিকা'র অর্ধেক কবিতা আমার মুখস্ত; শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো বই পনোরো-কুড়িবার ক'রে পড়েছি, একবার সারারাত জেগে গোকুল নাগের 'পথিক' পড়েছিলাম–আর ঐ ঝড়ঝাপটার সময় আমি যে কোনোভাবেই বেশামাল হ'য়ে পড়িনি তার কারণই তা-ই।[৩৯]

গদ্যশিল্পী বুদ্ধদেব বসুর জীবনে অনুবাদকের স্থান ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁকে সে-ভাষার বাক্যগঠন, ছন্দ, শব্দের ব্যবহার ও ব্যাকরণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয়েছে। যদিও সব ভাষার সঙ্গে তাঁর সমান পরিচয় ছিলো না এবং সর্বদা তাঁর অনুবাদ মূলভিত্তিকও হয় নি; তবু 'অনুবাদের কারণেই আমি প্রথম বুঝেছিলাম কোনো কবির পক্ষে অভিধান-চর্চার অভ্যাসটি কত উপকারী, ভাষাতত্ত্বে অল্পবিস্তর জ্ঞান কত প্রয়োজনীয়; শিখেছিলাম মাতৃভাষার অনেক নতুন শব্দ, এবং নতুন শব্দ তৈরি ক'রে নেবার উপায়; বুঝেছিলাম শব্দব্যবহারে যাথার্থ্যের মূল্য; বাংলা ছন্দকে আরো একটি সাবলীলভাবে চালাতেও হয়তো শিখেছিলাম।'[৪০]

কালিদাসের মেঘদূত অনুবাদ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বাংলা গদ্যের সংহতির জন্য সংস্কৃতের মুখাপেক্ষী হলেন। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কাঠামোয় ফিরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে নয়, বাক্যের শৃঙ্খলা ও চারুতার জন্য। আর এ-ব্যাপারে রাজশেখর বসুর *রামায়ণ* ও *মহাভারতে*র অনুবাদ তাঁর প্রচেষ্টাকে সহায়তা দান করলো। এভাবেই শেষজীবনে তিনি হলেন রাজশেখর বসুর পরিশীলিত, গতিশীল, প্রাঞ্জল ও সংবৃত গদ্যের অনুরাগী। বুদ্ধদেব বসুর তীক্ষ্ণ নজর ছিলো বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষার দিকে। তাই তিনি সংস্কৃতের নিয়ম-কানুন যথাযথ অনুসরণ করতে চান নি। *কালিদাসের মেঘদূত* গ্রন্থের 'অনুবাদকের বক্তব্য'-এ তিনি বলেছেন :

... আমরা আজকাল পুরোপুরি বাংলা ভাষাতেই লিখে থাকি– রবীন্দ্রনাথের মতো (বা যুবাবস্থায় আমাদেরই মতো) কখনো-কখনো আধা-সংস্কৃতে নয়– সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় উল্লেখ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছে যতিচিহ্নের প্রয়োগ, দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার প্রায় লুপ্ত, এবং শব্দ ব্যবহারে সংস্কৃত ও দেশজের মিশ্রণ অনেক বেশি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত।[৪১]

মেঘদূত অনুবাদকালে বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের কাঠামোয় যে লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা হলো তারই পরিণত রূপ *মহাভারতের কথা* (১৯৭৪)। এ-গদ্যের প্রধান অন্বিষ্ট স্পন্দনময়তার সমান্তরালে বাক্যের গাঢ়তা। এভাবেই সংস্কৃতের কাঠিন্য থেকে বাংলা গদ্যকে মুক্ত করে তাকে করলেন স্বমর্যাদায় মহীয়ান। বাংলা গদ্য হলো রসসম্পৃক্ত অথচ সংহত, স্বচ্ছন্দ অথচ প্রগাঢ় :

তিনি শাস্ত্রবিশ্বাসী নন, কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে তাঁর আস্থা নেই। তিনি জানতে চান তাঁর নিজের মন দিয়ে সত্যকে, জ্ঞানকে তাঁর চেতনার দ্বারা অন্তরঙ্গ ক'রে নিতে চান। মৃত্যু অনিবার্য জেনেও আমরা কেউ নিজের মৃত্যু ধারণা করতে পারি না–এই কথাটা অবশ্য খুবই পুরোনো; কিন্তু যুধিষ্ঠির যে এটাকে সবচেয়ে আশ্চর্য ব'লে ভাবলেন সেটাই আশ্চর্য।[৪২]

মহাভারতের কথার মধ্য দিয়েই বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যচিন্তা ও ভাষাচেতনা এক পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছিল। প্রথম খণ্ডের শিল্পৈশ্বর্য হয়তো আরো পরিশীলিত হয়ে পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডে ধরা দিত। কিন্তু শব্দসচেতন সাহিত্যিক *মহাভারতের কথা* অসমাপ্ত রেখেই নিঃশব্দে তিনি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। হয়তো তাই অসম্পূর্ণ থেকে গেল পূর্ণ-জীবনের তাৎপর্যময় কাহিনিও। পাঠক হলো বঞ্চিত– সাহিত্যও অপ্রাপ্তির গ্লানিতে খানিকটা সংকুচিত– হয়তো নিয়তি এমনই।

৬.

বুদ্ধদেব বসু নিশ্চয়ই এক বৈচিত্র্যপ্রয়াসী প্রতিভা– যার মধ্যে অন্যতম প্রধানরূপে অন্তর্লীন ছিল কবিতা। কথাটি বলার কারণ, যে গদ্যরীতির চর্চা তিনি করেছেন সেখানে কাব্যবিভাটুকু অন্তর্গত সহজাতরূপেই বিদ্যমান ছিল। এ প্রবন্ধে উল্লিখিত গদ্য-উদ্ধৃতিতে তা দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে। এর অর্থ, মন ও মননে তিনি ছিলেন রোমান্টিক। প্রসঙ্গত, রোমান্টিকতার ধরনে সাহিত্য সমালোচনা সৃষ্টি দুর্বহ, তবে প্রতিভাবান বুদ্ধদেব বসুর মতো সমালোচক তা সাধ্যায়ত্ত করতে সক্ষম হন। এ প্রবন্ধে আলোচ্য গদ্যরীতিতে তাঁর সমালোচকসত্তার সারার্থ ও ক্রম-বিবর্তন দেখানো হয়েছে। এ লক্ষণাক্রান্ত পরিমণ্ডলে তিনি যে বৈচিত্র্যানুসন্ধানী রোমান্টিক– এবং সেটি আত্মস্থ করেই বাংলা সমালোচানার যে একটি সৃষ্টিশীল পরিবেশ ও অনুগামী পদ্ধতি নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন– তারই একটি অভিমুখ এখানে রচিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর এই সক্ষমতা অনুসন্ধানের পথ ও পাথেয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে– কিন্তু এখানে উপলব্ধ কিছু নির্দেশনামূলক ইঙ্গিত উপস্থাপনের প্রচেষ্টা হয়েছে, যা বুদ্ধদেব বসুর গদ্যের একটি প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক দিক উন্মোচনের পথ অবমুক্ত করতে পারে।

তথ্য-সঙ্কেত

[১] 'মৃত্যুর পূর্বে বুদ্ধদেব বসু তিনটি নতুন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে পেরেছিলেন। ... *কবিতার শত্রু ও মিত্র* নামে এই গ্রন্থকে বলা চলে কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর সর্বশেষ রচনা।'–*কবিতার শত্রু ও মিত্র* (১৯৭৪) গ্রন্থের পেছনের কভারে মুদ্রিত প্রকাশকের ভাষ্যের অংশ বিশেষ। অবশ্যি 'আমার যৌবন' ১৩৮০ বঙ্গাব্দের (১৯৭৩) শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে

[২] অরুণ কুমার সরকার : আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য। উক্ত গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৭১) পরিশিষ্ট, পৃ. ২৪৫

[৩] বুদ্ধদেব বসু, "মাইকেল", *সাহিত্যচর্চা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২৬

[৪] "Preface to the Lyrical Ballads", *English Critical Texts*, Oxford University Press, London 1970, p. 180

[৫] বুদ্ধদেব বসু, *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৭০

[৬] তদেব

[৭] 'বস্তুত বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধই তাঁর আসল পরিচয়কে মূর্ত করে তুলে ধরেছে বলে আমার ধারণা। ব্যাপ্তিতে, পরিচর্যায়, গভীরতায়, এমন কি কাব্যিক ব্যঞ্জনায় বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ এক দীপ্ত, দৃপ্ত ও নিরলস কর্মের স্বাক্ষর হয়ে আছে।'–অসীম সাহা : "বুদ্ধদেব বসুর বৈচিত্র্যমুখিতা, তাঁর প্রবন্ধের ভাষা", 'উত্তরাধিকার' (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪, পৃ. ১৮৯

[৮] 'ইংরেজি Essay-র ন্যায় বাংলা প্রবন্ধেরও স্বরূপ-লক্ষণ, অর্থাৎ ইহার বিশেষ সংজ্ঞা ও সঠিক ক্ষেত্র নির্দেশ করা সহজ নহে। ইংরাজি Essay-র ন্যায় বাংলা প্রবন্ধেরও বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি হেতু ইহার স্বরূপ-ধর্ম সাধারণের নিকট সুস্পষ্ট হইতে পারে নাই।'–ড. শ্রী অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা*, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৩

[৯] সরদার ফজলুর করিম, *দর্শন কোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৩

[১০] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাঙলা-সাহিত্যের একদিক*, চতুর্থ মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১ ও ৮-৯

[১১] "It is important to hold fast to this: that poetry is at bottom a criticism of life; that the greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life,-to the question: How to live?- *Arnold: poetry & Prose*, Oxford University Press, London 1959, p. 144

[১২] "জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে", *কালের পুতুল*, নিউএজ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃ. ৪২

[১৩] "চাই–আনন্দের সাহিত্য", *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৫৪

[১৪] *কবি রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম প্রকাশ, ভারবি, কলিকাতা ১৯৬৬; ভূমিকা, পৃ. ৬

[১৫] *আমার ছেলেবেলা*, প্রথম প্রকাশ, এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৯৭৩, পৃ. ৯

[১৬] সম্পূর্ণ পত্রটি ১৩৮১ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য সংখ্যা' 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছে, পৃ. ২৪-২৫

[১৭] "রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প", *প্রবন্ধ সংকলন*, পৃ. ২০

[১৮] তদেব, পৃ. ২১

[১৯] 'কলকাতা' (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ১৯

[২০] বুদ্ধদেব বসু, *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, পৃ. ৫১

[২১] বুদ্ধদেব বসু, "সাহিত্য কেন", *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৬৩

[২২] বুদ্ধদেব বসু, "প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য", *কালের পুতুল*, নিউএজ সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৫৯, পৃ. ১৪

[২৩] "Pramatha Chaudhuri", *An Acre of Green Grass*, First Published, Orient Longmans Ltd, Calcutta 1948, pp. 20-21

[২৪] "সাহিত্য পত্র", *স্বদেশ ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৩৭-৩৮

[২৫] *আমার ছেলেবেলা*, প্রথম প্রকাশ, এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ১৯৭৩, পৃ. ৫৮

[২৬] 'বিদ্যাসাগর বা তারাশঙ্করের পর বাংলা ভাষা মৌখিক ভঙ্গির দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথও প্রথম রচনায় সেই গদ্যরীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু আবার কেন জানি না তাঁর হঠাৎ মনে হল বিদ্যাসাগরী সাধু ভাষার সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি।'–শ্রীভবতোষ দত্ত, "বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ", *রবীন্দ্রায়ণ*–১ম খণ্ড (শ্রীপুলিন বিহারী সেন সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ, বাক্ সাহিত্য, কলিকাতা ১৯৬১, পৃ. ১৪৬

[২৭] 'আমার কাছে নোয়াখালি মানেই ছেলেবেলা, ছেলেবেলা মানেই নোয়াখালি।'–"নোয়াখালি", *উত্তর তিরিশ*, পৃ. ২০২

[২৮] 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য বই আমি প্রথম পড়ি *ডাকঘর* আর *ছিন্নপত্র*–দুটোই টাউন-হল লাইব্রেরি [নোয়াখালি] থেকে ধার করে।'–*আমার ছেলেবেলা*, পৃ. ৫৬

[২৯] 'এখানে [নোয়াখালিতে] এখন কয়েকটি যুবক তো আছেন যাঁরা নূতন-কে লেখেন নতুন আর নতুন লেখেন ন-এ ওকার দিয়ে'; – "নোয়াখালি", *উত্তর তিরিশ*, পৃ. ২১১

[৩০] *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ট গল্প* (অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পা.), "রেখাচিত্র", প্রথম সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৫২, পৃ. ৩

[৩১] 'প্রগতি', অক্টোবর ১৯২৮

[৩২] বুদ্ধদেব বসু, "জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে", *কালের পুতুল*, পৃ. ৪১

[৩৩] বুদ্ধদেব বসু, *যবনিকা-পতন*, পুনর্মুদ্রণ ১৯৫২, পৃ. ২৭

[৩৪] বুদ্ধদেব বসু, *আমার বন্ধু*, ১৯৫৪, পৃ. ২৮

[৩৫] বুদ্ধদেব বসু, *লাল মেঘ*, ১৯৫৩, পৃ. ১

[৩৬] বুদ্ধদেব বসু, "পুরানা পল্টন", *হঠাৎ-আলোর ঝলকানি*, ১৯৫৮, পৃ. ৭

[৩৭] বুদ্ধদেব বসু, *মৌলিনাথ*, ১৯৫২, পৃ. ১৩০

[৩৮] "ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ", *কবি রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৬৬, পৃ. ১০৯

[৩৯] বুদ্ধদেব বসু, *রাত ভ'রে বৃষ্টি*, ১৯৬৭, পৃ. ৪৬

[৪০] বুদ্ধদেব বসু, "কবিতা ও আমার জীবন", *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, পৃ. ৬৪

[৪১] *কালিদাসের মেঘদূত*, চতুর্থ সংস্করণ, এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ১৯৬৮, পৃ. ৭১

[৪২] *মহাভারতের কথা*, 'দেশ', ১৬ বৈশাখ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৯৪